করে তুলতে পারে নি। ভক্তির রস আমাদের বুকে ও মুখে গড়িয়েছে, আমাদের মনে ও হাতে তা জমে নি। ফলে, এক গান ছাড়া আর-কিছুকেই আমরা নবরূপ দিতে পারি নি।

৭

এসব কথা যদি সত্য হয়, তা হলে স্বীকার করতেই হবে যে, আমাদের রূপজ্ঞানের অভাবটা আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দেয় না। কিন্তু একথা মুখ ফুটে বললেই আমাদের দেশের অন্ধের দল লগুড় ধারণ করবেন। এর কারণ কি, তা বলছি।

সত্য ও সৌন্দর্য, এ দুটি জিনিসকে কেউ উপেক্ষা করতে পারেন না। হয় এদের ভক্তি করতে হবে, নয় অভক্তি করতে হবে। অর্থাৎ সত্যকে উপেক্ষা করলে মিথ্যার আশ্রয় নিতে হবে; আর সুন্দরকে অবজ্ঞা করলে কুৎসিতের প্রশ্রয় দিতেই হবে। এ পৃথিবীতে যা-কিছু আছে, তা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—এক সু, আর-এক কু। সু-কে অর্জন না করলে কু-কে বর্জন করা কঠিন। আমাদের দশাও হয়েছে তাই। আমাদের সুন্দরের প্রতি যে অনুরাগ নেই, শুধু তাই নয়, ঘোরতর বিরাগ আছে।

আমরা দিনে-দুপুরে চীৎকার করে বলি যে, সাহিত্যে যে ফুলের কথা জ্যোৎস্নার কথা লেখে সে লেখক নিতান্তই অপদার্থ।

এঁদের কথা শুনলে মনে হয় যে, সব ফলই যদি ডুমুর হয়ে ওঠে আর অমাবস্যা যদি বারোমেসে হয়, তা হলেই এ পৃথিবী ভূস্বর্গ হয়ে উঠবে; এবং সে স্বর্গে অবশ্য কোনো কবির স্থান হবে না। চন্দ্র যে সৌরমণ্ডলের মধ্যে একটি প্রক্ষিপ্ত গোলক, সেবিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু ও রিফ্লেক্টর ভগবান আকাশে ঝুলিয়ে দিয়েছেন; সুতরাং জ্যোৎস্না যে আছে, তার জন্য কবি দায়ী নন, দায়ী স্বয়ং ভগবান। কিন্তু এই জ্যোৎস্নাবিদ্বেষ থেকেই এঁদের প্রকৃত মনোভাব বোঝা যায়। এ রাগটা আসলে আলোর উপর রাগ। জ্ঞানের আলোক যখন আমাদের চোখে পুরোপুরি সয় না, তখন রূপের আলোক যে মোটেই সইবে না—তাতে আর বিচিত্র কি। জ্ঞানের আলো বস্তুজগৎকে প্রকাশ করে, সুতরাং এমন অনেক বস্তু প্রকাশ করে, যা আমাদের পেটের ও প্রাণের খোরাক যোগাতে পারে; কিন্তু রূপের আলো শুধু নিজেকেই প্রকাশ করে, সুতরাং তা হচ্ছে শুধু আমাদের চোখের ও মনের খোরাক। বলা বাহুল্য, উদর ও প্রাণ প্রোটোপ্ল্যাজম্‌এরও আছে, কিন্তু চোখ ও মন শুধু মানুষেরই আছে। সুতরাং যাঁরা জীবনের অর্থ বোঝেন একমাত্র বেঁচে থাকা এবং তজ্জন্য উদরপূর্তি করা, তাঁদের কাছে জ্ঞানের আলো গ্রাহ্য হলেও রূপের আলো অবজ্ঞাত। এ দুয়ের ভিতর প্রভেদও

বিস্তর। জ্ঞানের আলো সাদা ও একঘেয়ে, অর্থাৎ ও হচ্ছে আলোর মূল ; অপরপক্ষে, রূপের আলো রঙিন ও বিচিত্র, অর্থাৎ আলোর ফুল। আদিম মানবের কাছে ফুলের কোনো আদর নেই, কেননা ও-বস্তু আমাদের কোনো আদিম ক্ষুধার নিবৃত্তি করে না ; ফুল আর-যাই হোক, চর্ব্য-চোষ্য কিংবা লেহ্য-পেয় নয়।

৮

এসব কথা শুনে আমার বৈজ্ঞানিক বন্ধুরা নিশ্চয়ই বলবেন যে, আমি যা বলছি সেসব জ্ঞানবিজ্ঞানের কথা নয়, সেরেফ কবিত্ব। বিজ্ঞানের কথা এই যে, যে আলোকে আমি সাদা বলছি, সেই হচ্ছে এ বিশ্বের একমাত্র অখণ্ড আলো ; সেই সমস্ত আলো রিফ্র্যাক্‌টেড অর্থাৎ ব্যস্ত হয়েই আমাদের চোখে বহুরূপী হয়ে দাঁড়ায়। তথাস্তু। এই রিফ্র্যাক্‌শন্‌এর একাধারে নিমিত্ত এবং উপাদান -কারণ হচ্ছে— পঞ্চভূতের বহির্ভূত ইথার-নামক রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-শব্দের অতিরিক্ত একটি পদার্থ। এবং এই হিল্লোলিত পদার্থের ধর্ম হচ্ছে— এই জড়জগৎটাকে উৎফুল্ল করা, রূপান্বিত করা। রূপ যে আমাদেব স্থূল-শরীরের কাজে লাগে না, তার কারণ বিশ্বের স্থূল-শরীর থেকে তার উৎপত্তি হয় নি। আমাদের ভিতর যে সূক্ষ্ম-শরীর অর্থাৎ ইথার আছে, বাইরের রূপের স্পর্শে সেই সূক্ষ্ম-শবীর স্পন্দিত হয়, আনন্দিত হয়, পুলকিত হয়, প্রস্ফুটিত হয়। রূপজ্ঞানেই মানুষের জীবন্মুক্তি, অর্থাৎ স্থূল-শরীরের বন্ধন হতে মুক্তি। রূপজ্ঞান হারালে মানুষ আজীবন পঞ্চভূতেরই দাসত্ব কববে। রূপবিদ্বেষটা হচ্ছে আত্মার প্রতি দেহের বিদ্বেষ, আলোর বিরুদ্ধে অন্ধকারের বিদ্রোহ। রূপের গুণে অবিশ্বাস করাটা নাস্তিকতার প্রথম সূত্র।

৯

ইন্দ্রিয়জ বলে বাইরের রূপের দিকে পিঠ ফেরালে ভিতরের রূপের সাক্ষাৎ পাওয়া কঠিন ; কেননা, ইন্দ্রিয়ই হচ্ছে জড ও চৈতন্যের একমাত্র বন্ধনসূত্র। এবং ঐ সূত্রেই রূপের জন্ম। অন্তরের রূপও যে আমাদের সকলের মনশ্চক্ষে ধরা পড়ে না, তার প্রমাণস্বরূপ একটা চলতি উদাহরণ নেওয়া যাক।

রবীন্দ্রনাথের লেখার প্রতি অনেকের বিরক্তির কারণ এই যে, সে লেখার রূপ আছে। রবীন্দ্রনাথের অন্তরে ইথার আছে, তাই সে মনের ভিতর দিয়ে যে ভাবের আলো রিফ্র্যাক্‌টেড হয়ে আসে, তা ইন্দ্রধনুর বর্ণে রঞ্জিত ও ছন্দে মূর্ত হয়ে আসতে বাধ্য। স্থূলদর্শীর স্থূলদৃষ্টিতে তা হয় অসত্য নয় অশিব বলে ঠেকা কিছু আশ্চর্য নয়।

মানুষে তিনটি কথাকে বড় বলে স্বীকার করে, তার অর্থ তারা বুঝুক আর না-বুঝুক। সে তিনটি হচ্ছে : সত্য শিব আর সুন্দর। যার রূপের প্রতি বিদ্বেষ আছে, সে সুন্দরকে তাড়না করতে হলে হয় সত্যের নয় শিবের দোহাই দেয় ; যদিচ সম্ভবত সে ব্যক্তি সত্য কিংবা শিবের কখনো একমনে সেবা করে নি। যদি কেউ বলেন যে, সুন্দরের সাধনা কর— অমনি দশজনে বলে ওঠেন, কি দুর্নীতির কথা। বিষয়বুদ্ধির মতে সৌন্দর্যপ্রিয়তা বিলাসিতা এবং রূপের চর্চা চরিত্রহীনতার পরিচয় দেয়। সুন্দরের উপর এদেশে সত্যের অত্যাচার কম, কেননা এদেশে সত্যের আরাধনা করবার লোকও কম। শিবই হচ্ছে এখন আমাদের একমাত্র, কেননা অমনি-পাওয়া, ধন। এ তিনটির প্রতিটি যে প্রতি-অপরটির শত্রু, তার কোনো প্রমাণ নেই। সুতরাং এদের একের প্রতি অভক্তি অপরের প্রতি ভক্তির পরিচায়ক নয়। সে যাই হোক, শিবের দোহাই দিয়ে কেউ কখনো সত্যকে চেপে রাখতে পারে নি ; আমার বিশ্বাস, সুন্দরকেও পারবে না। যে জানে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, সে সে-সত্য স্বীকার করতে বাধ্য, এবং সামাজিক জীবনের উপর তার কি ফলাফল হবে সেকথা উপেক্ষা ক'রে সে-সত্য প্রচার করতেও বাধ্য। কেননা, সত্যসেবকদের একটা বিশ্বাস আছে যে, সত্যজ্ঞানের শেষফল ভালো বই মন্দ নয়। তেমনি যার রূপজ্ঞান আছে, সে সৌন্দর্যের চর্চা এবং সুন্দর বস্তুর সৃষ্টি করতে বাধ্য— তার আশু সামাজিক ফলাফল উপেক্ষা ক'রে, কেননা রূপের পূজারীদেরও বিশ্বাস যে, রূপজ্ঞানের শেষফল ভালো বই মন্দ নয়। তবে মানুষের এ জ্ঞানলাভ করতে দেরি লাগে।

শিবজ্ঞান আসে সবচাইতে আগে। কেননা, মোটামুটি ও-জ্ঞান না থাকলে সমাজের সৃষ্টিই হয় না, রক্ষা হওয়া তো দূরের কথা। ও-জ্ঞান বিষয়বুদ্ধির উত্তমাঙ্গ হলেও একটা অঙ্গমাত্র।

তার পর আসে সত্যের জ্ঞান। এ জ্ঞান শিবজ্ঞানের চাইতে ঢের সূক্ষ্মজ্ঞান এবং এ জ্ঞান আংশিকভাবে বৈষয়িক, অতএব জীবনের সহায় ; এবং আংশিকভাবে তার বহির্ভূত, অতএব মনের সম্পদ।

সবশেষে আসে রূপজ্ঞান। কেননা, এ জ্ঞান অতিসূক্ষ্ম এবং সাংসারিক হিসেবে অকেজো। রূপজ্ঞানের প্রসাদে মানুষের মনের পরমায়ু বেড়ে যায়, দেহের নয়। সুনীতি সভ্যসমাজের গোড়ার কথা হলেও সুরুচি তার শেষকথা। শিব সমাজের ভিত্তি, আর সুন্দর তার অভ্রভেদী চূড়া।

অবশ্য হার্বার্ট স্পেনসার বলেছেন যে, মানুষের রূপজ্ঞান আসে আগে এবং সত্যজ্ঞান তার পরে। তার কারণ, যে জ্ঞান তার জন্মায় নি, তিনি মনে করতেন সে জ্ঞান বাতিল